Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩৪ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই মাঘ, ১৪২৯ / 24.01.2023

- সম্পাদক -

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

নববর্ষ ও জন্মদিন	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
মহাপ্রভু নীলকান্তের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
তারপরে হবে উত্তরণ	শ্রীমতী শ্রীলা মৈত্র
যুগান্তরে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

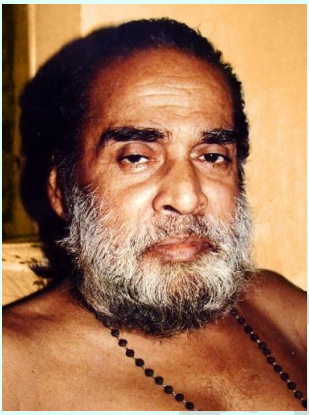

(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

নববর্ষ ও জন্মদিন

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ

নববর্ষ ও জন্মদিনের একটি তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। কাল অসীম অনন্ত চিরচলমান। কালের ন্যায় মানবাত্মাও অসীম অনন্ত চিরচলমান। এই কালকে মানুষ গণনা করে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ে অর্থাৎ দিন ও রাত্রিতে। এই নিয়মিত সংখ্যক দিন ও রাত্রির অন্তে পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে ঘুরে আসে এবং আবার শুরু করে নূতন প্রদক্ষিণ। মানুষের গণনায় এইটিই নববর্ষের প্রথম দিন। পক্ষান্তরে জন্মদিন তার কোন নির্দিষ্ট বৎসরের নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে ভূমিষ্ঠ হবার ক্ষণ। পরবৎসর সেই মাসের সেই তারিখে তার জীবনের পরমায়ু এক বৎসর পূর্ণ হয়। প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবী যেমন তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রতি বৎসর নূতন প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে মানবমাত্রও সেইরূপ তার অনন্ত যাত্রার গতি প্রতি বৎসর নূতন করে আরম্ভ করে প্রতি জন্মদিনে। কিন্তু বিগত বৎসরের অন্তের মধ্যে যেমন অসীম অনন্ত কালের যাত্রা খণ্ডিত হয়না সেইরূপ বিগত দিনের অন্তের মধ্যেও জীবন অনন্ত পথের যাত্রায় খণ্ডিত হয় না। কালের অনন্ত গতি যেমন বৎসরের সমষ্টিতে সীমায়িত নয়, সেইরূপ মানবাত্মার অনন্ত গতিও জন্মমৃত্যুর

DO NOT COPY

সমষ্টিতে সীমায়িত নয়। মানবাত্মার অনন্ত গতিতে জন্ম-মৃত্যু একটি সাময়িক ঘটনা মাত্র। চিরচলমান কালে নববর্ষ যেমন এক নূতন পদক্ষেপ সেইরূপ প্রতি জন্মদিনেও অমর মানবাত্মার এক নূতন পদক্ষেপ। তাই নববর্ষ আর জন্মদিন এই দুই উৎসব থেকে ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত ভাবে যে শিক্ষা আমাদের প্রাপ্য তা' গ্রহন করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব সেই শিক্ষাকেই জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের কাছে নববর্ষের কোন সার্থকতা থাকেনা যদি ৩৬৫ দিনের বর্ষপথের প্রতিটি পক্ষকে সার্থক করে তুলবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর না হই। নববর্ষের কি মূল্য আমাদের কাছে যদি চিরচলমান কালের অক্লান্ত কর্মোদ্যম ও অটল সহিষ্ণুতাকে আমাদের চলার পথে অভ্রান্ত পথ পরিদর্শন না করতে পারে? সেরূপ আবার মানবের কাছে তার জন্মদিনেরও কোন সার্থকতা থাকে না যদি ওই দিনে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যের প্রশ্ন তার মনে জাগরিত না হয়। যদি সে উপলব্ধি না করে যে সে নিখিল মানুষের এবং নিখিল মানুষ তার, যদি জীবনের মহৎ ও অনন্ত প্রত্যাশায় তার চিত্ত আজ বিশেষ ভাবে জাগ্রত না হয়। উৎসবের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও এই দুইটি উৎসবের বিশেষ সার্থকতা আছে। উৎসব মাত্রই মানুষের মিলন সেতু। তার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি উৎসবের দিনে প্রসারিত। দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ- দৈন্য, দারিদ্র্য, সহায়-অবলম্বন শূন্যতা – মানুষ সব ভুলে যায় এই উৎসবের দিনে। প্রেমের অপরাজেয় মহিমায় সে আজ প্রোজ্জ্বল। দীন ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষের সঙ্গে এক হয়ে বৃহৎ সমগ্র মানবের শক্তি অনুভব করে সে আজ মহৎ। সে আজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে, অসীম ভেদশূন্য সমগ্র বিশ্ব আজ তার আপন ঘর। এই উৎসব দুইটির নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবধারণে মানবাত্মার সর্বাঙ্গীন বিকাশ।

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

আবার একটি বছর ঘুরে এলো। শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন ১০ই মার্চ। কত যত্ন নিয়ে তাঁর প্রিয় ভক্তেরা এই দিনটি পালন করতেন এবং করেন। সক্কালবেলা শ্রী প্রদীপ বসু হাজির হতেন একটি মাছ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কুটে ভেজে দিতে হোত, কারণ, যিনি নিয়ে আসবেন তাঁর সেবা না হলে তো শ্রীপ্রীতিকুমার সে খাবার গ্রহণ করতেন না।

তারপর আসতেন শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বেদশাস্ত্রী, শ্রী সুধীর পালিত, পারিজাত দা, পল্লব রায়, নীরেন দা, আরও কত লোক। পা টিপে টিপে, হাসিমুখে আসতেন শান্তিদি। আসতেন শ্রী রাজকুমার নাগিয়া, শ্রী গৌরী শঙ্কর অবস্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই শ্রীপ্রীতিকুমার আমাদের রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন না। আমার ও বাপীর সাথে সময় কাটাবার সময় তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন প্রার্থনা পূরণের মাধ্যম।

অদ্ভুত ছিল তাঁর ভবিষ্যৎবাণী। শুধু বারবার বলতেন, "তুমি লিখে রাখো এই এই হবে .....।" তখন মেলেনি বলে পাত্তা দিইনি। ভেবেছি ঘটবে না। এখন দেখছি ঘটছে। তিনি যা যা বলেছিলেন তাই তাই ঘটছে। এখন যতো তাঁর কথা ভাবতে পারি আগে সে অবকাশ ছিল না। দিনরাত শুধু লোক আর লোক। কোনও সময়ে বাড়িটা খালি থাকতো না। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা যদি তাঁকে একটু বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করে দিতাম, একটু একা থাকতে দিতাম তাহলে হয়ত ঐ প্রাণ-প্রদীপটি টুপ করে নিভে যেত না। ক্ষতি আমাদের যা হল তা অপূরণীয়। তিনি যাবার সঙ্গে সঙ্গে যে ঝড় আমাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল তা' সহ্য করবার মত শক্তি খুব কম মানুষেরই থাকে।

আমার সব কথা লেখা সম্ভব নয়। সম্পাদনার সময় কাটা যাবে। আসলে আমার যে অভিজ্ঞতা, সম্পাদক মশাইয়ের সে অভিজ্ঞতা নয়। তিনি শৈশব থেকে যা চেয়েছেন, তাই পেয়েছেন। সংগ্রাম যা করতে হয়েছে, তা শ্রীপ্রীতিকুমারকে, একটি পরিবারকে রক্ষার জন্য। আমাকে করতে হয়েছে একটি শিশুকে লালন পালন করবার জন্য। সাধারণ অবস্থা থেকে অর্থনৈতিক অবস্থার

পরিবর্তনের পরিশ্রম একরকম, আর জনদরদী মানুষের সমাজ সেবার দায় আরেকরকম। এই দুটি দায় নিয়ে আমি হিমসিম খেয়েছি। সেদিন আমার পাশে কেউ ছিল না। আজ তবু শ্রীপ্রীতিকুমারের বিশেষ ভক্তবৃন্দ সাধ্যমত সহায়তা করেন। সেখানে আমার ঋণের পাহাড় জমছে।

এই জন্মদিনগুলো ঘুরে ঘুরে আসতো। তখন আমাদের কোনও দুঃখ ছিল না, অভিযোগ ছিল না। আমরা যেন অতিদূরের একজনকে কাছে পেয়েছিলাম। আর আজ? অতি কাছের একজনকে আরও কাছে পেয়েছি।

মুখে কখনও বিরক্তি দেখিনি। যখন আমার প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সুন্দর করে বলে উঠতেন, "হ্যাঁগো! একটু.....খানি চা দেবে?" কেউ এলে বলে উঠতেন, "ওকে একটু চা দেবে না?" নয়ত বলতেন, "একটু কষ্ট করবে কি আমার জন্য?" যখন সুস্থ ছিলেন, নিজেই চা করে ট্রেতে সাজিয়ে এনে মিষ্টি করে ডাকতেন, "উঠুন, উঠুন, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো .....।" "তুই" সম্বোধনটি একেবারেই পছন্দ ছিল না। একমাত্র নিজের ভাইবোনদের "তুই" বলতে দেখেছি। তাঁদের মধ্যে তিনজন আবার দাদাকে আপনি, আজ্ঞে সম্বোধন করতেন। আমাদের তো যখন তখন "আপনি" সম্বোধন করতেন। অথচ বিয়ের পর দীর্ঘকাল আমি তাঁকে "আপনি" সম্বোধন করেছি। সেই সম্বোধনে চিঠিও লিখেছি, তাতে তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। বলতেন, "এতে অপরে কিছু মনে করতে পারে।" আমি কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত - "কর, খাও, চল, যাও"- বলতে পারিনি। আমি বলেছি- "করা হবে, খেতে হবে, যেতে হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি .....।"

তাঁর জন্মদিনে আমি, বাপী, নীরেন দা, বা অন্য কেউ যদি কিছু উপহার দিতাম একগাল হেসে সেটি জড়িয়ে ধরতেন, যেন সারা জীবন ধরে ঐ জিনিষটি পাবার জন্যই সাধনা করছিলেন। এখন ভাবি ওই ধরণের মমতা না থাকলে এত জনপ্রিয় হওয়া যায় না। এমন বড় মাপের সাধক আমি আর দেখিনি। আমি অনেক আশ্রমে গেছি - অনেক "আনন্দ", "গিরি", "নাথ" দেখেছি, কিন্তু কাউকে আমার এত নির্বিকার, উদার, সংস্কারমুক্ত মনে হয়নি, দু-চারজন ছাড়া।

DO NOT COPY

শ্রীপ্রীতিকুমারের সঙ্গে দেখা করতে অনেক স্বামীজীরা বাড়ীতে আসতেন। গেরুয়াধারী হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করতেন, অবশ্য সকলকে নয়, আমাদের রীতিমত দৌড়ে এসে প্রণাম করতে হত এবং গোটা ফল, সরবত অথবা মিষ্টি সাজিয়ে দিতে হতো। তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন ১১ নয়ত ২১, নয়ত ৫১ অথবা ১০১ টাকা দিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে। তখন মনে হত কি প্রচণ্ডভাবেই না অর্থের অপচয় হচ্ছে। এখন আর মনে হয়না। এখন মনে হয় আমি নিজে ভালো কাজ করছি। সত্যি যাঁরা সমাজের সেবা করেন, ভালো করেন, তাঁরা অর্থ কোথায় পাবেন? ঐ টাকা তো জনহিতে ব্যয় হবে। এখন আর কোনও সঙ্ঘে টাকা দিতে আমার কষ্ট হয় না। অবশ্য দেবার মতো অনেক টাকা তো আমার নেই। যা পারি আর কি .....!

শ্রীপ্রীতিকুমার চিংড়ি মাছ খুব ভালবাসতেন বলে বাপী বাজারে চিংড়ি পেলেই নিয়ে আসতো। কিশোর মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে গলদা চিংড়ি নিয়ে ঢুকতো। সেটা রাত্রে রেখে পরদিন রান্না করবার ক্ষমতা ছিলনা আমার। সঙ্গে সঙ্গে কুটে বেছে কিশোরকে খাইয়ে দিতে হতো। এখন অবশ্য সে উৎপাত বন্ধ হয়েছে। এমনিতেই কিশোর যখন খুব প্রয়োজনীয় কথা বলে, মনে হয় চোখ বন্ধ করে মন দিয়ে মাছের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। বেশীরভাগ কথা শুনতে হলে মুখের কাছে কান নিয়ে যেতে হয়। শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে তার কি কথা হতো জানি না, তবে অনেকক্ষণ ধরে চলতো। সীতাপুরে দ্বিতীয়বার যাবার সময় বুঝেছিলাম কিশোরের দরকারী কথা কিছুই তিনি শুনতে পান নি। তাই কিশোরকে বলেছিলেন লিখে দিতে। সেই লেখাটি আমাকে পড়ে দিতে হল। আমাকে সতর্ক করে দিলেন, "খবর্দার! কিশোর যেন জানতে না পারে তুমি এসব জানো।" আমি কিন্তু সে বিশ্বাস রেখেছিলাম। এখন আমার খুব হাসি পায়। সকলে আমাকে জানে আমার পক্ষে কোনও কথা গোপন রাখা সম্ভব নয়, অথচ কত জনের কত গোপন সম্পর্ক, গোপন ব্যবসা বাণিজ্যের খবর আমার ঝুলিতে আছে। শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিনের স্মৃতিচারণ বেশী করার প্রয়োজন নেই। মোটামুটি বেশীরভাগ পাঠক তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁরা আপনমনের মাধুরী মিশায়ে শ্রীপ্রীতিকুমারকে গড়ে তুলবেন।

আমাদের কথা বলতে পারি যে, তিনি প্রয়াণকালে বড় বিপদের মধ্যে ফেলে গেছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘ তিন বছর একটি অবিশ্বাসী মনকে তিল তিল করে বিশ্বাসী করে তুলেছেন। আমি এমনিতেই টেনশনে ভুগি চিরকাল, যার জন্য প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, "এখন তোমার কারখানায় কি চলছে?--" আমার কারখানা কিন্তু এখন আর বন্ধ হয় না। সেখানে দিনরাত ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত হৃদয়ের ছাপ।

দিন কেটে যায়। আমরা সেই অনেক দূরের জনসমাবৃত শ্রীপ্রীতিকুমারকে পৃথকভাবে নিজের করে পেয়েছি। এখানে বাধা দেবার কেউ নেই। কেড়ে নেবার কেউ নেই। এ প্রীতিকুমার আমাদের একেবারে নিজস্ব সম্পদ। এঁকে হারাবার ভয় নেই। কোনও সময়ে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিতে হয়না। দেরী করে খাবার জন্য রাগ করতে হয়না। বেশী লোকজন আসবার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতে হয় না। এ প্রীতিকুমারকে যে যার নিজের মতো করে পাবেন ....।

কবির কথায় বলতে হয় --

নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা
শিল্পীর তুলির টানে টানে,
ফোটেনি তাহার মাঝে
ছবির চরম পরিচয়;
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে।

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(** রচনাকাল - ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০)

বলরাম বসু

ঠাকুর ও বলরাম বসুর মধ্যে সম্পর্ক ছিল পরম আত্মীয়তার। ঠাকুর যেমন যুগে যুগে অবতার, বলরামও তেমনি যুগে যুগে তাঁর পার্ষদ। চৈতন্য অবতারেও যে বলরাম ছিলেন ঠাকুর ভাবাবস্থায় তা জানতে পেরেছিলেন। "সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গো সব দেখেছিলাম। তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম। বলরামকেও যেন দেখেছিলাম।"

বলরাম ঠাকুরের কথা প্রথম জানতে পারেন কেশবচন্দ্র সেনের সংবাদ পত্র থেকে। তখন তিনি উড়িষ্যার কোঠারে ছিলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করেন। সেদিন কেশবচন্দ্র সেন সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। তাই একান্তে ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হচ্ছিল না। ঠাকুর কিন্তু নিজেই একফাঁকে আত্মীয়সুলভ আন্তরিক ভাবে বলরামকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার কি কথা আছে বল।" বলরাম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বাড়িতে দেবসেবার ব্যবস্থা ছিল। তিনি নিজে ধ্যান-জপ পরায়ণ ছিলেন। তথাপি ঈশ্বরে অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হননি। তাই তিনি প্রথম দর্শনেই ঠাকুরকেই প্রশ্ন করে বসলেন, "ভগবান আছেন কি?" ঠাকুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তিনি যে শুধু আছেন তাই নয়, আপনার ভেবে ডাকলে তিনি দর্শন দেন। নিজের ছেলেমেয়েতে যেমন মমত্ববোধ আছে, তাঁকেও সেই রকম ভেবে ডাকতে হয়।" এই কথাতেই যেন বলরামের মনের বদ্ধ দরজা খুলে গেল, তিনি নতুন আলোর সন্ধান পেলেন।

প্রথম দর্শনেই ঠাকুরের প্রতি বলরামের এমন ভালবাসা এসেছিল যে তিনি রাত পোহাতে না পোহাতেই আবার দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেন। ঠাকুরও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে বললেন, "ওগো, মা বলেছেন, তুমি যে আপনার জন; তুমি যে মা'র একজন রসদ্‌দার, তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে - কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।" ঠাকুর সকলের জিনিস গ্রহণ করা দূরে থাকুক ছুঁতেও পারতেন না। আর বলরামের উপর কি কৃপা, তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। ঠাকুরের

কৃপায় কৃত-কৃতার্থ বলরাম ঐ দিনই নিজ হাতে বাজার করে আবার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। শুধু একদিনের ব্যাপার নয়, প্রতিমাসেই বলরাম ঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হতেন। আন্তরিকতা যতই বাড়তে লাগল, যাতায়াতও বৃদ্ধি পেল। ক্রমে দক্ষিণেশ্বর ও বলরাম ভবনের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পেতে লাগল। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িকে ঠাকুর 'মা-কালীর কেল্লা' বলে বর্ণনা করতেন। বলরাম ভবনকে 'দ্বিতীয় কেল্লা' বলে নির্দেশ করা যায়। ঠাকুর শতাধিক বার বলরাম ভবনে পদার্পণ করেছেন এবং সেখানে দিব্যলীলার অনুষ্ঠান করেছেন।

বলরামের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত পছন্দ করেন নি। কথাটা শেষ পর্যন্ত বলরামের জ্যাঠতুতো ভাই কটকের প্রসিদ্ধ উকিল রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসুর কানে যায়। বলরাম তাঁরই বাড়িতে থাকতেন। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমনই দাঁড়ায় যে বলরামকে ঠাকুরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে হরিবল্লভবাবু তাঁকে তাঁর বাড়ি খালি করে কোঠারে গিয়ে তত্ত্বাবধান করতে নির্দেশ দেন। ঠাকুরের পুণ্য সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় বলরাম খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ঠাকুর সে কথা জানতে পেরে সেই সমস্যার সমাধান করে দেন। হরিবল্লভ এই সময় হঠাৎ কলকাতায় আসেন। ঠাকুর হরিবল্লভের বাল্য বন্ধু গিরিশচন্দ্র ঘোষের মারফৎ তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আহ্বান জানান। ঠাকুরের সুমিষ্ট ব্যবহার, দিব্যভাবোজ্জ্বল মূর্তি, ঘন ঘন ভাবসমাধি এবং অমৃতময় বাণীর প্রভাবে হরিবল্লভের মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি নিজেই ঠাকুরের অনুরাগী ভক্তে পরিণত হয়ে গেলেন। ফলে বলরামের আর কোন সমস্যা রইল না। তিনি মনের আনন্দে ঠাকুরের সেবা ও সঙ্গ করে চললেন।

বলরামের প্রতি ঠাকুরের অশেষ কৃপা ছিল। তিনি তাঁর গৃহকেই অন্যতম লীলানিকেতনে পরিণত করেন। ঠাকুর সাধারণতঃ দক্ষিণেশ্বর থেকে অন্য কোথাও গিয়ে রাত্রিযাপন করতেন না, দক্ষিণেশ্বরেই ফিরে আসতেন। বলরাম ভবনের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটত। তিনি সেখানে বহুবার রাত্রিবাস ও অন্নগ্রহণ করেছেন। ঠাকুর বলতেন, বলরামের অন্ন শুদ্ধ। বলরামের আহ্বানে ঠাকুর রথোৎসবেও বলরাম ভবনে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতেন এবং ঠাকুরকে ঘিরে আনন্দের

জোয়ার বইত। রথযাত্রা উপলক্ষে বলরাম ভবনে সংকীর্তনানন্দের আভাস দিয়েছেন পুঁথিকারঃ

"ভক্ত বসু বলরাম মাথায় পাগড়ি।
নাচেন প্রভুর পাশে দোলাইয়া দাড়ি।।
কৃষ্ণকায় তেজচন্দ্র বসু চুণিলাল।
শ্রীমনোমোহন রাম দেবেন্দ্র রাখাল।।
কৃতদার হরিপদ হরিণ নয়ন।
সুন্দর শরৎ শশী কুমার দুজন।।
বারান্দা কাঁপায় নাচে অভিমানি বর।
বিলাসী গিরিশ ঘোষ গুরু কলেবর।।
নাচেন নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।
সাকার হৃদয়ে যাঁর নাহি পায় স্থান।।

"লীলা প্রসঙ্গ"-কার স্বামী সারদানন্দ রথোৎসবের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেনঃ ছোট একখানি রথ বাহির বাটীর দোতলায় চকমিলানো বারান্দার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত - একদল কীর্তনীয়া আসিত, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত, আর ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ এই কীর্তনে যোগদান করিতেন। কিন্তু সে আনন্দ, সে ভগবদ্‌ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সেই মধুর নৃত্য – সে আর অন্যত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে ও শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে আবির্ভূত – সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডেরও হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রুরূপে বাহির হইত - ভক্তের আর কি কথা।"

ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হলে ভক্তেরা তাঁর চিকিৎসার জন্যে বাগবাজার দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করেন। সে বাড়ি ঠাকুরের পছন্দ হয়নি। বলরামকে তিনি এতই আপনার বলে মনে করতেন যে তিনি সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ভক্তসঙ্গে বলরাম ভবনে এসে উঠলেন, বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ করলেন না। ঠাকুরের এই কৃপায় অভিভূত বলরাম ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন

মনোমত বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি যেন তাঁর গৃহে অবস্থান করেন। করুণাময় ঠাকুর ভক্তের সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। ঠাকুরের অবস্থান কালে বলরাম ভবন নৃত্যগীত এবং ভগবৎ প্রসঙ্গে মুখর হয়ে থাকত।

ঠাকুরের কৃপার কথা স্মরণ করে কথামৃত-কার লিখেছেন – ধন্য বলরাম! তোমার আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে! কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন – যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন।"

শুধু বলরাম নয়, বলরামের পরিবার পরিজন আত্মীস্বজনও ঠাকুরের কৃপা লাভে ধন্য হয়েছিলেন। বলরামের শ্যালক বাবুরাম ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ পার্ষদে পরিণত হন। বলরামের সহধর্মিণী কৃষ্ণভাবিনীকে ঠাকুর শ্রীমতীর অষ্টসখীর প্রধানা বলে নির্দেশ করেছিলেন। বলরাম ভবনে অবস্থান কালে তিনি সপার্ষদ ঠাকুরের সেবায় নিরত থাকতেন। বলরামের পিতা রাধামোহনকেও ঠাকুর নানাভাবে কৃপা করেছিলেন। বলরামের সন্তানরাও ঠাকুরের পরম স্নেহাস্পদ ছিলেন। এঁদের ভক্তিতে ঠাকুর এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বলরাম-গৃহিনী কৃষ্ণভাবিণী দেবী অসুস্থ হলে তিনি শ্রীশ্রীমাকে যানবাহনের অভাবে পায়ে হেঁটে সেখানে যাবার কথা বলেন; যদিও শেষ পর্যন্ত মাকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়নি। একখানা পালকি যোগাড় হওয়ায় মা তাতে করে বলরাম ভবনে গিয়েছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে প্রায়ই 'মাষ্টার' নামে সম্বোধন করতেন। বলরামের মতো ঠাকুর তাঁকেও চৈতন্যদেবের সংকীর্তন দলে ভাবদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এতেই অনুমান হয় ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল। ঠাকুর নিজ মুখেও সে সম্পর্ক ব্যক্তও করেছিলেন। একদিন তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, "তোমায় চিনেছি - তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন, এক সত্তা, যেমন পিতা ও পুত্র।" যেখানে সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের সেখানে পুত্রের

প্রতি পিতার যে বাৎসল্য থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। সন্তান বৎসল পিতার মতো ঠাকুরও যে তাঁর এই প্রতিভাবান উচ্চ সংস্কার সম্পন্ন আধ্যাত্মিক সন্তানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার পর মাষ্টারমশাই তাঁর প্রতি একটি দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করতেন। সুযোগ পেলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছুটে যেতেন। দু একদিন ঠাকুরকে না দেখলে তাঁর মন কেমন করত। ঘরে বসে থাকলেও তিনি সর্বদা দক্ষিণেশ্বরের চিন্তা করতেন। এই টান দেখে ঠাকুর খুশী হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, "তোমার এখানকার প্রতি এত টান কেন? কলকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারও প্রীতি হল না, তোমার হল কেন? এর কারণ জন্মান্তরের সংস্কার।" আসলে এ টান তো ঠাকুরের। ঠাকুর তাঁকে টেনে ছিলেন বলেই তিনি অন্য জাগতিক সব টানকে অগ্রাহ্য করে তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন। যশ মান অর্থ ঐশ্বর্যের আকর্ষণ সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

ঠাকুর বলতেন মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ। তাঁর সব সন্তানই যাতে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে সেজন্যে ঠাকুর চেষ্টার ত্রুটি করতেন না, যখন যেমন শিক্ষার দরকার ঠাকুরও সেই শিক্ষাই দিতেন। মাষ্টারমশাইকেও তিনি নানা উপদেশ এবং সাধন সম্পর্কিত নির্দেশ দিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চতর স্তরে তুলে নিয়েছিলেন। সংসারে থেকেও যাতে তাঁর ঈশ্বরাসক্তি অক্ষুন্ন থাকে সেজন্যে তিনি মা জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "সংসারে যদি রাখ, তো এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে, মা? আচ্ছা, শেষে যা হয় করো।"

সংসারের পরিবেশ অনুকূল না হলে সাধনভজন সম্ভব নয়, আবার সংসারে আসক্ত হলেও ঈশ্বরলাভ অসম্ভব। ঠাকুর কৃপা করে মাষ্টার মশাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে সংসারে থাকতে হবে। একদিন তাঁকে ডেকে ঠাকুর বললেন, "ছেলে হয়েছে বলে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাড়িতে থাক। তাদের জানিও তুমি যেন তাদের আপনার। ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।" শুধু এইটুকু বলেই ঠাকুর ক্ষান্ত হননি। কিরূপে ঈশ্বরে

মন রাখতে হবে তাও বলে দিয়েছিলেন – "ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ – ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।" এই উপদেশ অনুসারে চলবার জন্যে মাষ্টার মশাই চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে এসে দু-চারদিন থাকতেন। একবার একটানা মাসখানেক ছিলেন। কথামৃত পাঠে জানা যায় তিনি সঙ্গে রান্না করার লোকও এনেছিলেন। এই সময় তিনি ঠাকুরের নির্দেশ মতো চলতেন। ঠাকুর কলকাতায় কোন ভক্তবাড়ি যাচ্ছেন শুনে তিনিও তাঁর সঙ্গে গিয়ে নিজের বাড়ির পরিবার পরিজনদের দেখে আসার ইচ্ছা করেছিলেন। পাছে তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন ঈশ্বর চিন্তায় ব্যাঘাত হয় সেইজন্যে ঠাকুর তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হননি।

প্রথম জীবনে মাষ্টার মশাই কেশবচন্দ্র সেনের ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। সেই কারণে তিনি নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তা করতে ভালবাসতেন। ঠাকুর তা জেনে তাঁকে সেই অনুসারে উপদেশ দিতেন। কি করে নিরাকারের ধ্যান করতে হয় তা মাষ্টার মশাইকে দেখিয়ে দেওয়া দরকার মনে করে ঠাকুর তাঁকে মতিশীলের ঝিলে নিয়ে যান এবং ক্রীড়ারত মাছগুলোকে দেখিয়ে বলেছিলেন নিরাকার ব্রহ্মে মন ঐভাবে নিমগ্ন আছে বলে চিন্তা করতে হয়।

ভগবান নিজে ধরা না দিলে কোন ভক্তই তাঁকে ধরতে পারে না। ঠাকুরের নিত্য সঙ্গ ও নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে মাষ্টার মশাইয়ের কাছে ঠাকুরের দিব্য স্বরূপ ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ঠাকুর স্বয়ং ভগবান, নরদেহে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। ঠাকুরের কাছেও তিনি নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি। ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে তিনি একদিন ঠাকুরকে বলেন, আমার মনে হয় যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য ও আপনি এক। ঠাকুর এই বক্তব্য অনুমোদন করে বলেছিলেন, এক বৈকি, এক। একদিন ঠাকুর অবতার

প্রসঙ্গে বলেছিলেন অবতার যেন দেওয়ালের একটা বড় ফাঁক যার ভিতর দিয়ে অনন্ত ঈশ্বরকে দেখা যায়। তারপর মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "বল দেখি সে ফাঁকটি কী?" মাষ্টার মশাই নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, সে ফোকর আপনি। ঠাকুর তখন খুশী হয়ে মাষ্টার মশাইয়ের গা চাপড়ে বলেছিলেন, "তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ - বেশ হয়েছে।" ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের শুধু এইটুকু জানলেই হবে যে তিনি কে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের কী সম্পর্ক। সেই বিচারে মনে হয় মাষ্টার মশাই চূড়ান্ত উপলব্ধিতে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

মাষ্টার মশাইয়ের প্রতি ঠাকুরের সবচেয়ে বড় কৃপা হল এই যে তিনি তাঁকেই তাঁর কথার ভান্ডারী করে গেছেন। ঠাকুরের কথার সৌন্দর্যে চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে অনেক ভক্তই সেগুলি লিপিবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ঠাকুর তাঁদের অনুৎসাহিত করে বলেছিলেন ওরে, এ কাজ তোর নয়। একমাত্র মাষ্টার মশাইকে তিনি কখনও বাধা দেননি। মাষ্টার মশাই দিনক্ষণ, সন তারিখ সহ তাঁর উপদেশাবলী দিনলিপির আকারে সংরক্ষণ করেছিলেন, পরে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনার পর সেগুলি "শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" নামে পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সুবাদে শ্রীম'র নাম আজ জগৎবিখ্যাত। শ্রীশ্রীমা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন – 'এক সময় তিনি তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যক মত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। এই সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে।" ঠাকুরের কৃপায় ঠাকুরের অমৃতময় বাণীর ধারক, বাহক এবং প্রচারকের গৌরব লাভ করে তিনি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করতেন।

অধরলাল সেন

অধর লাল সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পাছে উচ্চ পদ তাঁর ঈশ্বর লাভের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে তাই ঠাকুর তাঁকে প্রথমেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি ডেপুটি; এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে দু দিনের জন্য। সংসার

কর্মভূমি, এখানে কর্ম করতে আসা।" ঠাকুরের এই উপদেশ নিষ্ফল হয়নি। নানা বিষয় কর্মের মধ্যে থেকেও তিনি মনটাকে ঈশ্বরমুখী করে রাখতেন।

ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার আগেও অধরলাল ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করতেন, বৈষ্ণব সাধকদের সঙ্গ করতেন, কিন্তু তার মনের সংশয়ের নিরসন হয়নি। একদিন বৃদ্ধ সাধক সারদাচরণকে বলেছিলেন, "তোমাদের ভাব দেখে ভাবের উপর আমার একটা ঘৃণা হয়েছিল। তোমাদের ভাব দেখে মনে হত যেন ভিতরে কত যন্ত্রণা হচ্ছে। ভগবানের নামে কি যন্ত্রণা থাকে? ঠাকুরের আনন্দঘন মধুর হাসি ও মাধুর্যময় ভাব দেখে আমার চোখ ফুটল। ব্রহ্মানন্দজীও বলেছিলেন, ঠাকুরকে দর্শন না করলে - তাঁর কাছে আসা যাওয়া না করলে অধরবাবুর মনের সংশয় ঘুচত না।"

ঠাকুর অধরলালকে দিব্যানন্দের কিছু স্বাদও দিয়েছিলেন। একদিন তিনি তাঁর জিবে কি যেন লিখে দিলেন, অমনি তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে ঈশ্বরীয় আনন্দ উপভোগ করেন। অধরলালকে ঠাকুর খুব ভালবাসতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যেতেন। একদিন মাষ্টার মশাইকে বলেছিলেন, ভাবে দেখলাম- অধরের বাড়ি, বলরামের বাড়ি, সুরেন্দ্রর বাড়ি, এসব আমার আড্ডা। ওঁরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নেই।

ঠাকুর কিছুদিন না গেলে অধরও যে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। একদিন ঠাকুর যেতেই অধর তাঁকে বললেন, "আপনি অনেকদিন আসেন নি। আমি আজ ডেকেছিলাম, এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।" এ কথা শুনে ঠাকুর আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, "বল কি গো!"

ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে কিছু দিব্যানুভূতি লাভ করলেও লোকমান্যির প্রতি অধরের তখনও মোহ ছিল। ধীরে ধীরে তিনি যেন আরো বেশী বিষয়-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস-এর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ফেলো মনোনীত করেন। ফলে কোন কোন দিন অফিসের পরে সেনেটের সভায় উপস্থিত থাকতে হত। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এইসব লক্ষ

করে ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, “দেখ, এসব অনিত্য, মিটিং স্কুল অফিস-এসব অনিত্য। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। সব মন দিয়ে তাঁকে আরাধনা করা উচিত। শরীর এই আছে এই নাই; তাড়াতড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।” এই ঘটনার পর অধর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। মনে হয় অধরের আসন্ন মৃত্যুর কথা জেনেই ঠাকুর তাঁকে একান্তভাবে ঈশ্বরমুখী করতে চেয়েছিলেন যাতে অবশিষ্ট সময়ে জীবনের মূল লক্ষ্য - ঈশ্বর লাভ হয়।

অধর অবশ্য মান মর্যাদা, অর্থ ঐশ্বর্য লাভ করে ঠাকুরকে ভুলে যাননি। প্রায় প্রত্যহই তিনি অফিসের পর দক্ষিণেশ্বর যেতেন ঠাকুরের কথামৃত পান করে, মা ভবতারিণীর আরতি দেখে শেষে বাড়ি ফিরতেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে উৎসব করতেন। ঠাকুরও ভক্ত সমভিব্যাহারে সেখানে গিয়ে আনন্দ করতেন। দুর্গাপূজার সময়েও ঠাকুর অধরের বাড়িতে এবং প্রতিমার সম্মুখে ভাবমগ্ন হতেন। ঠাকুর কয়েকদিন না গেলে অধর বলতেন, “আপনি অনেকদিন এ বাড়িতে আসেননি। ঘর মলিন হয়েছিল, যেন কি এক রকম গন্ধ হয়েছিল।” অধরের বাড়িতে উৎসবে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ঠাকুর সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। অধর সুবর্ণবণিক এই কথা চিন্তা করে কেউ কেউ প্রসাদ গ্রহণে দ্বিধা করতেন। তবে ঠাকুরকে প্রসাদ গ্রহণ করতে দেখে অনেকে নিজেদের দ্বিধা জয় করতেন। ঠাকুরের অন্যতম গৃহীভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ও একদা অনুরূপ দ্বিধার শিকার হয়েছিলেন। ঠাকুরের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করলে তিনি বলেছিলেন, “ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্নও খাওয়া যায়।”

ঠাকুর অধরকে অশ্বারোহণ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পতনের ফলে অধরের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঠাকুর তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁর বাক্‌শক্তি নেই। ঠাকুরকে দেখে তাঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। ঠাকুর তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। অধরের মৃত্যুর পর ঠাকুর শোকে মুহ্যমান হয়ে মা জগদম্বার কাছে দুঃখ জানিয়ে বলেছিলেন, “মা তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো এই অবস্থা।”

DO NOT COPY

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনটি আর কোন ক্ষেত্রে হয়েছিল কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভের পূর্বে গিরিশচন্দ্র অসাধারণ কবি ও নাট্য প্রতিভা সত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে তাঁর অকল্পনীয় পরিবর্তন হয়। তাঁর এই পরিবর্তনের সঙ্গে জগাই মাধাইয়ের পরিবর্তনের সাদৃশ্য আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গিরিশ ও তাঁর আবাল্য বন্ধু ঠাকুরের অন্যতম গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষ নিজ পল্লীতে জগাই-মাধাই নামেই পরিচিত ছিলেন। ঠাকুরের কৃপায় কালীপদেরও পরিবর্তন হয়।

গিরিশ ঠাকুরকে দেখেন বোসপাড়ার দীননাথ বসুর বাড়িতে। ইতিপূর্বে তিনি ঠাকুরের কথা পড়েছিলেন ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায়। কিন্তু তখন ঠাকুরকে বোঝার ক্ষমতা বা মানসিকতা - কোনটাই তাঁর ছিল না। তবে ঠাকুরের আগমনের সংবাদ পেলে তিনি গিয়ে দর্শন করতেন। একদিন তিনি পাড়ার চৌরাস্তায় একটা রকে বসেছিলেন। এই সময় ঠাকুর ঐ পথ দিয়ে ভক্ত সঙ্গে গাড়ি করে বলরাম ভবনে যাচ্ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে নমস্কার করতে গিরিশও প্রতি নমস্কার করলেন, কিন্তু ততক্ষণ গাড়ি এগিয়ে গেছে। গিরিশের মনে হল কেউ যেন তাঁকে প্রবল বেগে টানছে। গিরিশ যন্ত্র চালিতবৎ বলরাম ভবনে হাজির হলেন । সঙ্গে সঙ্গে খবর পেলেন ঠাকুর তাঁকে ডাকছেন। ইতিপূর্বে গিরিশ ঠাকুরের কোন কোন ব্যবহারকে ঢং বলে সন্দেহ করেছিলেন। গিরিশকে দেখে হঠাৎ উঠে ঠাকুর প্রথমে বললেন, বাবু আমি ভালো আছি। তারপর বললেন, "না, না, ঢং নয়, ঢং নয়।" গিরিশ আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন এ নিশ্চয়ই তাঁর সেই সন্দেহের উত্তর। কিছুদিন পূর্বে গিরিশ গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। এখন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গুরু কি?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "গুরু কি জান? – যেমন ঘটক। তোমার গুরু হয়ে গেছে।" তখনও গিরিশ বুঝতে পারেননি, স্বয়ং ভগবান অহৈতুকী কৃপায় তাঁকে আকর্ষণ করে এনে তার ভার গ্রহণ করেছেন। তবে বুঝতে দেরি হল না। ঠাকুরের অমোঘ শক্তি তাঁর

মনের প্রতিরোধকে ভেঙ্গে দেয় এবং গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের পদতলে পতিত হয়ে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

গিরিশ মদ খেতেন, মাতলামি করতেন কিন্তু ঠাকুর কখনও তাঁকে মদ ছাড়তে বলেননি। জনৈক ভক্তকে তিনি বলেছিলেন, "না গো না, ওকে কিছু বলতে হবে না, ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে।" যীশুখ্রীষ্ট বলতেন, পাপকে ঘৃণা কোর, পাপীকে নয়। ঠাকুর তাঁর চেয়েও আর এককাঠি উপরে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুর লাটুকে পাঠিয়ে খোঁজ নিতেন তিনি গাড়িতে কিছু ফেলে গেছেন কিনা। লাটুকে দিয়ে কাশীপুরে তামাক সাজিয়ে খাওয়াতেন, ফাগুর দোকান থেকে তামাক আনিয়ে নিতেন। শুধু তাই নয়, লোকে দেখে বিস্ময় মেনেছে, যখন ঠাকুর নিজে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না তখন তিনি নিজে হাতে জল গড়িয়ে গিরিশকে দিয়েছেন। এই স্নেহ ভালবাসার কি কোন তুলনা আছে? গিরিশ নিজেও আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, "জানি না তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি... তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া খাওয়াইতেন - আবার পিতার ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের আদর্শ। ..... আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাকে বলে জানি না, কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মত ভালবাসিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই নাই, কিন্তু তিনি আমার পরম বন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় অধিক ভালবাসিতেন।"

গিরিশ মনে মনে ঠাকুরকে সন্তানরূপে কামনা করেছিলেন। একদিন মাতাল অবস্থায় ঠাকুরকে ধরে বসলেন, "তুমি আমার ছেলে হবে বল।" ঠাকুর রাজী হলেন না। গিরিশ রেগে মেগে ঠাকুরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিলেন। ঠাকুর নির্বিকার চিত্তে শুনে গেলেন। কিন্তু অন্যান্য ভক্তরা ব্যাথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ঠাকুরকে পরামর্শ দিলেন তিনি যেন আর কখন গিরিশের কাছে না যান। পরের দিন ঠাকুর ভক্ত রাম দত্তের মতামত জানতে চাইলে তিনি বললেন, "দেখুন, কালীয় সাপ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল - "প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, আমি অমৃত পাব কোথায়?"-গিরিশ বাবুরও সেই দশা, তিনি অমৃত পাবেন কোথায়?" রামবাবুর

কথা শুনে ঠাকুর বললেন, “তবে চল, রাম তোমার গাড়িতেই একবার সেখানে যাই।” ঠাকুর উপস্থিত হলে গিরিশ বুঝলেন, এ মানুষের কাজ নয়, নররূপে নারায়ণই কেবল এই অপরাধ ক্ষমা করতে পারে। ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, “আজ যদি তুমি না আসতে ঠাকুর, তাহলে বুঝতুম, তুমি এখনও নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারনি - তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসেনি। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই। আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি আর তোমায় ছাড়ছি না। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে।”

ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে গিরিশ জানতে চেয়েছিলেন, “এখন থেকে আমি কি করব?” ঠাকুর বলেছিলেন, “যা করছ করে যাও। এখন এদিক ওদিক দুদিক রেখে চল, তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে, তখন যা হয় হবে। তবে সকাল বিকালে স্মরণ মননটা রেখো।” গিরিশ কোন নিয়মের অনুবর্তী হতে চান না। তাই চুপ করে রইলেন। ঠাকুর তাঁর মনের ভাব বুঝে বললেন, “আচ্ছা তা যদি না পার তো শোবার আগে তাঁর একবার স্মরণ করে নিও।” গিরিশ যেন তাতেও রাজী না। তাই চুপ করেই রইলেন। ঠাকুর যেন নিজেই গিরিশের উত্তর উচ্চারণ করে বললেন, “তুই বলবি, তাও যদি না পারি, - আচ্ছা তবে আমায় বকলমা দে।” এবার যেন কথাটি গিরিশের মন মতো হল। তিনি সকল দায় ঠাকুরের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তবে তখনও তিনি বকলমার গূঢ় অর্থ বোঝেননি। এখন তাঁর সব কিছুই ঠাকুরের; ‘আমি’, ‘আমার’ বলারও পর্যন্ত অধিকার রইল না। তবে বকলমার গুণেই গিরিশ শেষ পর্যন্ত সব আসক্তি জয় করতে পেরেছিলেন। তিনি বলতেন, ‘ঠাকুরের কাছে আর সকল শুদ্ধসত্ব ছেলেরা এসেছিল, আর এমন পাপ নেই যা আমি করিনি। তবু তিনি আমায় গ্রহণ করেছিলেন।...তিনি নিজে নিষেধ করেণ নি - সব আপনি ছুটে গেল।” তাই গিরিশ অহংকার করে ঠাকুরকে বলতেন, “তুমি আসবে আগে জানলে আরো বেশী করে অপচার করে নিতুম।”

ঠাকুরের স্পর্শে, ঠাকুরের কৃপায় গিরিশ ভক্তি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। ঠাকুর বলতেন গিরিশের পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস। শ্যামপুকুরে যে রাত্রে ঠাকুর কালীপূজা করেছিলেন সে রাত্রে গিরিশই প্রথম ঠাকুরকে জগন্মাতা রূপে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। আবার কাশীপুরে কল্পতরু হওয়ার ঠিক আগে ঠাকুর গিরিশকেই প্রশ্ন করেছিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলে বেড়াও তুমি কি দেখেছ ও বুঝেছ?" সেদিন গিরিশ করজোড়ে ভক্তিগদগদকন্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, "ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেনি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারি?"

সর্বদা রামকৃষ্ণ চিন্তায় পূর্ণ গিরিশ থিয়েটার বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর নিষেধ করে বলেছিলেন, "তুমি যা করছ তাই কর, ওতেও লোকশিক্ষা হবে।" ঠাকুর জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন তিনি যেন গিরিশ প্রভৃতি কয়েকজনকে লোকশিক্ষার জন্যে শক্তি দেন। জগন্মাতা সেই প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন।

মহাপ্রভু নীলকান্তের অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

বলাগড়ের গোস্বামীরা হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গা দেবীর বংশজ। এই বংশেই মহাপ্রভু নীলকান্তের জন্ম হয়। উক্ত বংশের তৃতীয় পুরুষ বলরাম ঠাকুর ও অষ্টম পুরুষ গোপালকৃষ্ণ ঠাকুর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বহু শিষ্যকে মন্ত্র দেন।

গোপালকৃষ্ণ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণাতে বিয়ে করেন। তার মধ্যে ঢাকা মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ও থানার অধীন ৩৯নং মৌজার শিলিমপুর গ্রামে তিনি দুটি বিয়ে করেন। উক্ত দুই স্ত্রীর মধ্যে কনিষ্ঠা স্ত্রী দুর্গাদেবীর গর্ভে মহাপ্রভুর পিতা দীননাথের জন্ম হয়।

DO NOT COPY

দীননাথ সাতটি বিয়ে করেন। তার মধ্যে শিলিমপুর নিবাসী সর্বকনিষ্ঠা মুক্তকেশীর গর্ভে মহাপ্রভু নীলকান্ত ও তার কনিষ্ঠ ভাই নিশিকান্তের জন্ম হয়।

এই নীলকান্ত হচ্ছেন সিদ্ধ সাধক। ইনি গৃহী হয়েও সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটাতেন। ঐ দুটি পুত্র ছাড়া দীননাথের অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভে আরও পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

যাইহোক, সকলের তুলনায় নীলকান্তই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ছিলেন যোগী। ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করে নিজেকে এবং নিজের বংশকে গৌরবের শিখরে উন্নীত করেছিলেন।

নীলকান্তের অলৌকিক বিভূতির সীমা পরিসীমা নেই। এখানে তাঁর কয়েকটি লীলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি।

ভূপেন্দ্রনাথ গুহ হচ্ছেন কোলকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবি। তিনি মহাপ্রভু নীলকান্তের শিষ্য। একদিন বিকেলে তিনি হাইকোর্ট থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে দোতলার ঘরে এসে শুয়েছেন।

তখন চৈত্র-বৈশাখ মাস হবে। সুতরাং আবহাওয়া বেশ গরম। সামান্য পরিশ্রমে শরীরে নামে ক্লান্তির বোঝা।

ভূপেন গুহ যে ঘরে শুলেন, সেই ঘরে তাঁর স্ত্রী প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। কেবল তিনদিকের তিনটি জানালা খোলা ছিল। ঐ জানালাগুলিতে লোহার গরাদ বসানো ছিল। স্ত্রী এসে ভূপেন গুহর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

তাঁর সামান্য তন্দ্রার ভাব এলো। চোখ বুঁজলেন। হঠাৎ 'চোর, চোর' বলে চীৎকার শুনে ভূপেন গুহ চোখ মেলে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

স্ত্রী বিশেষ উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, ঘরে চোর ঢুকেছে। তক্তাপোশের নীচে লুকালো।

স্ত্রীর কথা শুনে ভূপেন গুহ তক্তাপোশের নীচে উঁকি মেরে দেখলেন ঘর শূন্য - কোন দিকে কিছু নেই।

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঘরের দরজা তো বন্ধ, চোর এলো কোন দিক থেকে?

DO NOT COPY

স্ত্রী বললেন, ঐ জানালা দিয়ে এসেছে।

– কিন্তু তা কি করে সম্ভব? জানালায় বড় বড় লোহার রেলিং রয়েছে, মাত্র চার আঙুল ফাঁক। চোর কি করে ঢুকলো? তারপর?

-- তারপর, চোর ঘরে ঢুকে তক্তাপোশের কাছে এলো। আর তার শরীর ক্রমশঃ লম্বা হতে হতে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত পৌঁছলো।

-- তুমি কি তখন তন্দ্রাযুক্ত ছিলে?

-- কখনই না।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। হাইকোর্টের ছুটি হল। ভূপেন গুহ একাকী শিলিমপুর গেলেন। সেখানে তাঁর গুরুদেব নীলকান্ত তখন অবস্থান করছিলেন। ভূপেন গুহ গুরুদেবের কাছে পূর্ব ঘটনার আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা করলেন। সবকিছু শুনে নিয়ে গুরুদেব বললেন, তোমার স্ত্রী যা দেখতে পেয়েছে ভালই দেখেছে। কেননা আমিই গিয়েছিলুম তোমাদের দেখতে। সে যদি ধৈর্য ধরে থাকতো তাহলে আরও কিছু দেখতে পেত। আমি তোমাকে কোন কিছু দেখাতে পারিনা। সুতরাং সেই যে চীৎকার করলো ও তুমি চোখ মেললে, আমি কি আর করি, চোরের মত ঢুকলুম।

গুরুদেবের কথা শুনে ভূপেন গুহ উচ্চরবে হাসতে আরম্ভ করলেন। সেই হাসিতে যোগ দিলেন গুরুদেবও।

নীলকান্তের আর একটি অলৌকিক কাহিনীর কথা তাঁর প্রিয় শিষ্য ভূপেন্দ্রচন্দ্র গুহের স্বরচিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করছি।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ। প্রায় একমাস কৃপাপ্রার্থী আমি ঘোরাঘুরি করিতেছি। কোন কথা, হাঁ – না, কিছুই প্রভু বলিতেছেন না। একদিন বেলা অনুমান ২/২-৩০ মিনিট হইবে, যামিনীবাবু কাছারীতে, আমি ও তিনি – বৈঠকখানা ঘরে মাত্র দুইজনা। হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "নীচে আসন করিয়া বস।" আমি তদ্রূপ বসিলাম। আমার মস্তকে কতক্ষণ হস্ত রক্ষা করিয়া আমার শরীরে শক্তি সঞ্চারপূর্বক "যাহা বলি, মনে রাখিস্," ইহা বলিয়া মহাপ্রভু আমাকে কামবীজে দীক্ষা, কাম গায়ত্রীতে শিক্ষা দিলেন। তিনি যে অন্তর্যামী তাহা সেদিন

ভাল করিয়া বুঝিলাম। আমাকে মাত্র এই কথা কয়টি বলিলেন – "বৎস, তোমাকে এমন মন্ত্র দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিলো না। কাশী ঘোষ গং আমাকে দিতে বাধ্য করিল, তোমার পাঠের সময়, তুমি এখন মন দিয়া পড়াশুনা কর, যেন পাশ হইয়া যাইতে পার। যখন তুমি তোমার পিতার ন্যায় স্বাধীন জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে, তখন তোমার সাধনের ঠিক সময় হইবে। গুরুর বাক্যে বিশ্বাসই মূল কথা। এই যে মন্ত্র ইহাও আমারই বাক্য। সুতরাং গুরু বাক্য পালন করিও।"

তখন আমি হাই ইংরেজি স্কুলের ১ম শ্রেণীতে পড়ি। অনেকদিন যাবৎ লেখাপড়া করিনা, কেবল হরিনাম করি। তাহাতে মন সর্বদা উচাটন থাকে কেবল সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভের জন্য মন অস্থির হয়। এমত অবস্থায়, শ্রীগুরুদেবের বাক্যে স্রোতমুখে বিশাল উপলখণ্ডবৎ আমার জীবনের স্রোত হঠাৎ পরিবর্তিত হইল। বই লইয়া বসিলাম। কোনপ্রকারে "এনটেন্স" পরীক্ষা পাশ করিয়া আই.এ. পড়িতে লাগিলাম। ক্রমশঃ বি.এ. পাশপূর্বক কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছি ৩/৪ বৎসর, যেই আমার সময় হইল, গুরুদেবের আমাকে মনে হইল। আমার নিকট একটি মোকদ্দমা পাঠাইয়া লোক মারফতে পত্র দিলেন। ঐ পত্র মধ্যে কি শক্তি নিহিত ছিল, পাঠমাত্র গুরুর প্রতি প্রবল অনুরাগ জন্মিল এবং বাং ১৩২১ বা ১৩২২ সনের ভাদ্র মাস হইতে সুযোগ পাইলেই আমি শিলিমপুর যাতায়াত আরম্ভ করিলাম। তিনি তখন তালুকদারগণ হইতে মাসিক ১৫ টাকা পেনশন পাইয়া বাড়িতে অবস্থান করিতে ছিলেন। আমাকে মন্ত্র দেওয়ার সময়ই প্রকারান্তরে বলিয়াছিলেন যে আমাকে ওকালতি ব্যবসায় করিতে হইবে এবং মন্ত্রের শক্তি প্রকাশ হইতে বিলম্ব আছে। তিনি আমাকে ১৪ বৎসর বয়সের সময় মন্ত্র প্রদান করতঃ আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যবসা কি হইবে বলিয়াছিলেন, কারণ আমার পিতৃদেব ছিলেন ঢাকার উকিল।

মহাপ্রভু নীলকান্তের অলৌকিক ক্ষমতার সীমা-পরিসীমা নেই। একদিন মহাপ্রভুর ভক্ত ভূপেন্দ্র গুহ তাঁর গুরুদেবের কাছে এসে বলতে লাগলেন, বাবা আমার ভাগ্নে রাম বিলেতে থেকে পড়াশুনো করছে। আমার একান্ত ইচ্ছে ওর

DO NOT COPY

কাছে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই। ও আপনার তৈলচিত্র বিলেত থেকে আঁকিয়ে আনবে।

তাই শুনে মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, বৎস, এখন ক্ষান্ত হও। সময় হলে আমি বলবো।

এরপর ছ'মাস কেটে গেল।

একদিন মহাপ্রভু একটা চিঠি লিখলেন তাঁর শিষ্য ভূপেন গুহকে, আমার ছবি তৈরি করার ইচ্ছে থাকলে এখনই বিলেতে টাকা পাঠাও।

ভূপেন গুহ তখন গুরুদেবের কথামত ২৫০ টাকা পাঠিয়ে দিলেন বিলেতে। এরপর দীর্ঘ একটা বছর কেটে গেল। বিলেত থেকে কোন খবর এল না। এই অবস্থায় পুজোর ছুটিতে ভূপেন গুহ চলে এলেন শিলিমপুরে গুরুদেবের কাছে।

একদিন গভীর রাতে মহাপ্রভু হঠাৎ চোখ মেলে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন, যদি গুরুর পা ছবিতে না থাকে, তবে সেই ছবির আদর শিষ্যেরা করেনা।

ভূপেন গুহ প্রশ্ন করলেন, এর মানে কি?

তখন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, বৎস, চিত্রকর আমার ছবিটি একটু নীচু থেকে আঁকা আরম্ভ করে। বাঁ পা আঁকা শেষ হল যখন, তখন কাগজের নীচে আর জায়গা কুলায় না। সুতরাং চিত্রকর স্থানাভাবে কোনোমতে পায়ের ২/১ টি আঙ্গুল ছবিতে দেখিয়েছে মাত্র। তাতে মনে হয়, নীচের বাঁ পায়ের আঙ্গুলের কাছের অংশ যেন ট্রামে কেটে গেছে। সুতরাং তুমি কোন রকমে কোলকাতার আর্টিষ্ট দিয়ে ঐ ভুল শুধরে না দিলে তোমার টাকা পয়সা খরচ বৃথাই যাবে।

ভুপেন গুহ মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বিলেতে গিয়ে নিজের চোখে এসব দেখে এসেছেন?

গুরুদেব বললেন, এ আমার পক্ষে জলভাতের মত সহজ সরল ব্যাপার।

শেষকালে গুরুদেবের কথাই ঠিক হল। ঐ ছবিটি যখন কোলকাতায় এসে পৌঁছোলো তখন ভূপেন গুহ মোড়ক খুলে দেখেন ঠিকই নীচের পা খানা ট্রামে কাটার মত হয়ে আছে। ওখানে আর জায়গা নেই যেখানে পায়ের সব আঙ্গুলগুলি আঁকা যায়।

DO NOT COPY

পরে ভূপেন গুহ কোলকাতার নামী চিত্রকর কার্ত্তিক দত্তকে দিয়ে ছবির অপূর্ণ অংশ আঁকিয়ে নিলেন। কার্তিক দত্ত এঁকে দিলেন বটে, তবু কিছু খুঁত রয়ে গেল। তিনি বললেন, ছবি হলো সত্যি কথা, কিন্তু বিলেতের মত রঙের মিশ্রণ হল না।

এমনি ধারা অলৌকিক ক্ষমতা ছিল নীলকান্তের। তিনি বিলেতে না গিয়ে ঘরে বসেই সেখানকার খবরাখবর বলে দিতে পারতেন।

ঠিক ঠিক ভাবে ঈশ্বরে নির্ভরতা থাকলে ভক্তের কোন অভাব থাকে না। সে যা চায় তাই পায়। কিন্তু আমরা সাধারণ ক্ষুদ্র জীব। আমাদের রয়েছে জ্ঞানশূন্য অহমিকা । সেই শূন্য জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমরা নিজেরা কর্তা সেজে সংসারে অনর্থ ঘটাই। অথচ একবারও ভাবিনা যে কর্তার কর্তা বলে আর একজন আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে চাইতে পারি না, এমন কি আত্মসমর্পন করতে লজ্জা বোধ করি। আমরা ভুলে যাই গীতায় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণাবতারের কথাঃ-

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামী মা শুচ ।।

মহাপ্রভু নীলকান্তও তাঁর শিষ্যদের এমনিধারা উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, আত্মনির্ভর না করে শ্রীকৃষ্ণে নির্ভর কর।

এই কথার যৌক্তিকতা মহাপ্রভু নীলকান্ত নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন। যখন তিনি যুবক, সেই সময় তিনি ঈশ্বরে সমর্পণ করে যে অলৌকিক ফল পেয়েছিলেন সেই কথা শিষ্য ভূপেন গুহকে নিজের মুখে বলেছেন। আমি এখানে তাঁর সেই জবানবন্দী উদ্ধৃত করছিঃ

“শুন বৎস, আমার যৌবন কালের একটি কাহিনী। একদা ধানকুনিয়া হইতে বাড়ি আসিয়াছি। হাতে কপর্দক মাত্র নাই। তৎপরদিন মা আসিয়া প্রাতে বলিলেন, বৎস, চাল বাড়ন্ত; কাল সবে বন্দর হইতে আসিয়াছ তাই কাল বলি নাই। মাতা জানিতেন যে, তালুকদারদের ঘর হইতে তালতলার বহু দোকানী চালাদি সস্তায় ক্রয় করে; সুতরাং চাল আমি বাকিতেও আনিতে পারিব। আমি মাতৃবাক্য শুনিয়া স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখন

মনে হইল এতগুলি জীবের আহার তো তিনিই জুটাইতেছেন, আজ তিনি কি করেন, যদি আমি তালতলা না যাই? কেনই বা আমি বাকি চাইব? না হয় উপবাস করিয়া থাকিব। যদি ৩/৪ দিন উপবাসেও চাল না আসে? তবে মরিব, তবুও ভিক্ষা করিব না। ইহা ভাবিয়া চাদরখানা রাখিয়া বসিয়া রহিলাম। শুনিতেছি বধূকে মা বলিলেন, তুমি স্নান করিয়া আসিয়া উনান ধরাও। কিন্তু পরে শুনিলাম, মা বধূকে বলিতেছেন, জ্বাল ধরাও এবং হাঁড়িতে জল ফুটাইতে থাকো। চাল আসিল বলিয়া। বেলা ১০টা বাজিয়া গেল, তবু চাল আসেনা দেখিয়া মাতৃদেবী পুনরায় দক্ষিণের ঘরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন আমি স্থির মনে বসিয়া। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- "নীলকান্ত! তুই চাল আনিতে যাস নাই?" "না মা, যাই নাই।" ইহা শ্রবণে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া মা পূর্বের ভিটার ঘরে ঢুকিয়া চেঁচাইয়া বধূকে বলিলেন - "বৌ, আমার শরীর-মন ভালো নয়, আমাকে কেহ ডাকিও না, আমি শুইয়া থাকিব।" ইহা বলিয়া মা ঠাস করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। আমি সবই বুঝিতেছি। আমার মন কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বধূ পুনঃ পুনঃ জল গরম করিয়া নাড়া বৃথা পোড়া হইতেছে দেখিয়া আর হাঁড়িতে জল দিবে না মনস্থ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় বাহির বাটিতে একটি আগন্তুকের কথার শব্দ পাইলাম। কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এইটা কি নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের বাটী? আমি উত্তর করিলাম, "কে? আসুন ভিতরে।" তখন একটি লোক আসিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিল, "আমি ভাগ্যকুল রাজা শ্রীনাথ রায়ের বাড়ী হইতে আসিয়াছি; তাঁর কন্যার বিবাহে আপনাকে নিমন্ত্রন করা হয় কিন্তু আপনি যান নাই। পণ্ডিত বিদায়ের টাকা এই নেন এবং লোক সঙ্গে ভোজ্য আনিয়াছে। মা'কে ডাকিয়া বলিলাম, মা, তুমি আসিয়া দ্রব্যসকল তুলিয়া নেও। সেই ভোজ্য ছিল চাল ডাল তৈল, তরকারি, দধি ইত্যাদি। মা আসিয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

দেখ বৎস! তাঁর উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা কর।"

মহাত্মা গান্ধী তখন জারবেদা জেলে আটক রয়েছেন। ভক্ত ভূপেন গুহ ঐ সময় শিলিমপুর যান তাঁর গুরুদেবকে দেখতে।

শিলিমপুর গ্রামে কোন পত্রিকা যায় না, গেলেও কেউ রাখে না।

একদিন নীলকান্তর পুত্রবধূ ও ভূপেন গুহ দু'জনে নীলকান্তের পা টিপে দিতে লাগলো।

তখন নীলকান্তর হাঁপানীর প্রকোপ কিছুটা কম। তিনি চোখ বুজিয়ে বসে আছেন। ইতিমধ্যে তিনি কোন কথা তাঁর পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করলেন। ভূপেন গুহ সে কথা ভালোভাবে শুনতে পেলেন না। তবে তিনি বুঝতে পারলেন যে গুরুজী ঐ কথা যেন বহুদূর হতে জিজ্ঞেস করছেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি চোখ মেলে তাকালেন।

তখন মনমোহনের বিধবা পত্নী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কর্তা, বলুন তো আপনি কোথায় গিছলেন?

তখন সামান্য হেসে নীলকান্ত জবাব দিলেন, তুমি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, আমি জারবেদা জেলে গান্ধীকে যে ঘরে আটকে রেখেছে সেখানে গেছলুম। আমি কেন, ভারতের সকল মহাপুরুষই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কেন না, সেদিন সেখানে আমাদের সভা ছিল।

তখন স্বদেশী ভূপেন গুহ নিতান্ত উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, বলুন, বলুন, ভারত স্বাধীন হবে কবে?

মহাপ্রভু হেসে বললেন, সেই জন্যেই তো আমরা সেখানে গেছলুম। স্বাধীন হতে কিছু দেরী আছে।

ভূপেন গুহ প্রশ্ন করলেন, যুদ্ধ, রক্তারক্তি হয়ে কি স্বাধীনতা লাভ হবে?

গুরুজী বললেন, না আপনিই স্বাধীন হবে। এরপর তিনি ভূপেন গুহের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, বৎস, ইংরেজি ১৯৩২ সালের বছর মনে রেখো।

তাঁদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা সম্ভবত ১৯২৩ সালে হয়ে থাকবে। ভূপেন গুহ গুরুজীকে প্রশ্ন করলেন, কেন?

মহাপ্রভু নীলকান্ত বললেন, এই সময় হতে কলির সর্বোৎকৃষ্ট সময়, সত্যযুগের শুরু। ১৩৬০ বাংলা সন হতে একশো বছর পৃথিবীর খুব ভালো সময়। এমন সময় দীর্ঘকাল মধ্যে আর হবে না।

DO NOT COPY

ভূপেন গুহ প্রশ্ন করলেন, কি করে সত্য যুগ আসবে? প্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হবে, তারপর আসবে?

মহাপ্রভু বললেন, না, না, খণ্ড প্রলয় হচ্ছে ও হবে। যারা দুষ্ট, বদলোক, সংশোধন যাদের কোন প্রকারেই হবে না, তারা নানাভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, যথা, অনাহারে, অপমৃত্যুতে, রণে ইত্যাদি। আর বাকি অল্প দুষ্ট লোক ভাল হয়ে যাবে। এভাবে সত্যযুগের উৎপত্তি জানবে।

একটু থেমে আবার বললেন মহাপ্রভু নীলকান্ত, মহাপুরুষগণ প্রায় সকলেই চললেন ভারতবর্ষ আঁধার করে।

এভাবে সেদিন মহাপ্রভু ভূপেন গুহের কাছে দেশের আগামী দিনের অনেক ঘটনা- দুর্ঘটনার কাহিনী বলে যান।

তারপরে হবে উত্তরণ **শ্রীলা মৈত্র**

নিঃসীম নীল অন্ধকারে
উধাও আমার মন
ডানা ভাঙা ক্লান্ত পাখীর মতন
আশ্রয়ের সন্ধানে।
কোথাও সে কুলায়?
জননীর নিশ্চিন্ত আশ্বাস?
কোথায় সে সাদর আহ্বান --
এসো এসো
এসো এই শান্তির কোলে।
এখানে নেই দুঃখের অসহ্য দহন
শান্ত হোক মন
তারপরে হবে উত্তরণ ।।

DO NOT COPY

যুগান্তরে **সুনন্দন ঘোষ**

ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান হয়, পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ।
সীমানা ভাঙে, হৃদয় ভাঙে, বিশ্বাস ভাঙে।
কাঁটা তারের দুপারে জমাট বেঁধে থাকে রক্ত আর চোখের জল।
লাখো শিশু রমণীর সম্ভুক্ত নিথর দেহ।
লাখো পুরুষের নিস্পন্দ চাহনি।

তারপরও সূর্য ওঠে।
বৃষ্টি পড়ে,
চিতার আগুন নেভে, কবরে ঘাস উঁকি মারে।
গীর্জার ক্যারোল, আজানের ডাককে ছাপিয়ে
সামগান ভেসে আসে সময়ের কুয়াশা পেরিয়ে।
গোঠের বালক জন্ম নেয়
বেথলেহেমে, কপিলাবস্তুতে, ...

যুগে যুগে মানুষ নিজেকে হারায়,
যুগান্তরে আবার খুঁজে পায়
প্রেমের আশ্লেষে।

DO NOT COPY